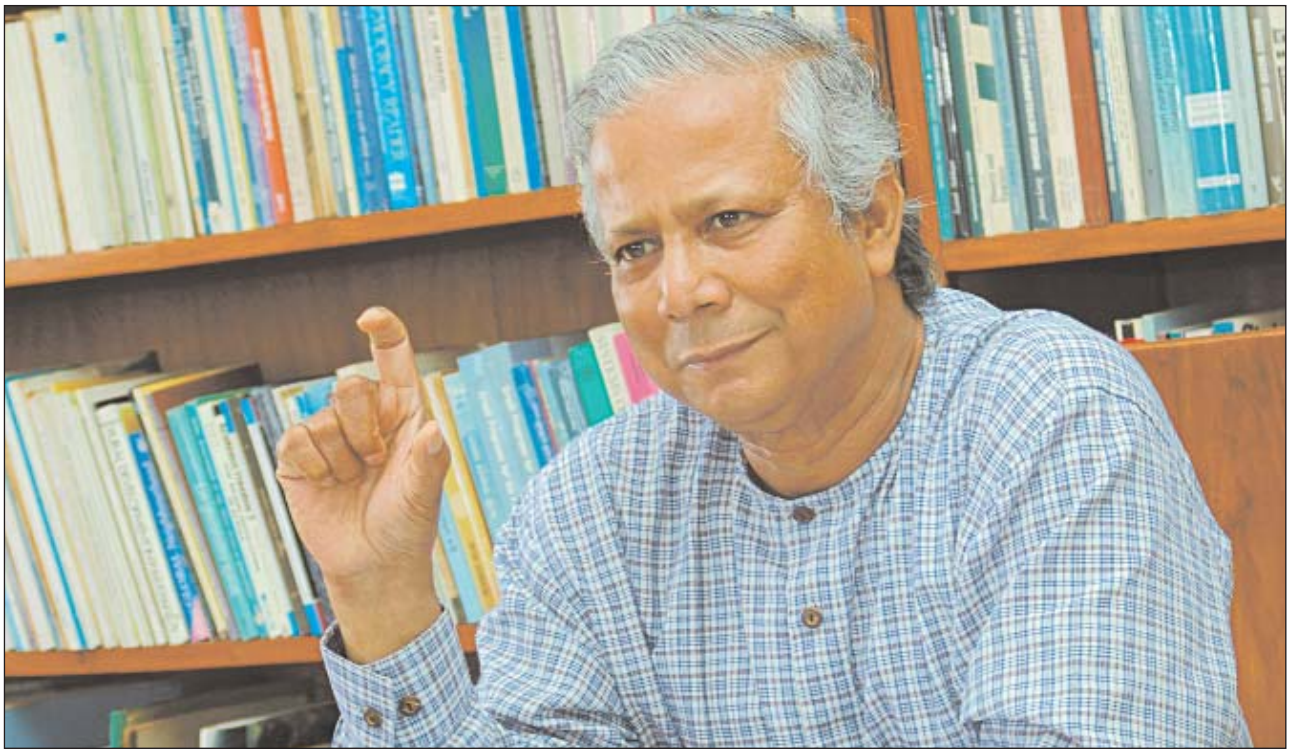

Ôm‡`i nvi †ewk... mgv‡jvPbv bq, KvR K‡i †`Lvb WvOvq `wo‡q cwb‡Z mvZvi wKfv‡e KvU‡Z nq †mUv ejvi †Kv‡bv A_ bvBÕ

W. gnv¤§` BDbm

mv¶vrKvi wb‡q‡Qb
†Mvjvg †gv‡ZvRv I mv‡R`i ingvb

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৪০ সালের ২৮ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির ওপর অধ্যয়ন করেন। সেখানেই তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ফিরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হন। ১৯৭৬ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক প্রজেক্ট শুরু করেন এবং ১৯৮৩ সালে এ প্রকল্পকে গ্রামীণ ব্যাংক নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের মানুষ, বিশেষত মহিলাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস দেশী-বিদেশী অনেক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। সম্প্রতি তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এসব নানাবিধ কারণে ড. ইউনূস বিশ্বজুড়ে আলোচিত। পৃথিবীর অনেক দেশ শুধু ড. ইউনূসের কারণে বাংলাদেশকে চেনে। তিনি এখন শুধু ব্যক্তি নন, নিজেকে পরিণত করেছেন একটি প্রতিষ্ঠানে।

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রতিটি মানুষেরই ক্ষমতা আছে। দরিদ্র মানুষের সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। শুধু সুযোগটা করে দেয়া গেলে দরিদ্র মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তন করতে পারে। এ রকম একটা ধারণা থেকেই তো গ্রামীণ ব্যাংক শুরু করেছিলেন?

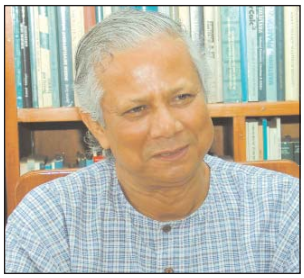

ড. মুহাম্মদ ইউনূস : যখন শুরু করেছি তখন জানা ছিলো না আমরা কোথায় যাচ্ছি। ক্ষুদ্র ঋণ বলে কিছু একটা চালু করবো, একটা ব্যাংক বানাবো, এরকমটা চিন্তার মধ্যে ছিলো না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। পাশেই ছিলো গ্রাম। আমাকে দিয়ে যদি গ্রামের দু-চারটা সমস্যার সমাধান হয়, করি না কেন?

এটা করতে গিয়েই এটা করেছি, ওটা করেছি। এখানে ওখানে খামার করেছি। এটা করতে গিয়ে 'মহাজনী'র ওপর নজর পড়লো। নিজের থেকে পয়সা দিয়ে কয়েকজনকে মহাজনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে দিলাম। তখনও মনে হয়নি একটা নতুন কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। যারা মহাজন থেকে ছাড়া পেলো তারা খুব খুশি হলো। তখন ভাবলাম এটার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।

মহাজন শুধু উচ্চহারে সুদই নিত না, আরো অনেক ধরনের শর্ত জুড়ে দিতো। একজন মহিলা মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল এভাবে যে, মহিলা বাঁশ কিনবে, সেই বাঁশ দিয়ে মোড়া বানাবে। সেই মোড়াগুলো মহাজনের কাছেই বিক্রি করতে হবে। মহাজন যে দাম দেবে সেই দামেই বিক্রি করতে হবে। অবস্থা এমন ছিলো যে, মহাজন বিনে পয়সায় মোড়া নিয়ে নিচ্ছে। খুব অল্প পরিমাণ পয়সা ওই মহিলা পেতো। আমি এই অবস্থার পরিবর্তন চাইলাম। আমি ওই মহিলাকে বাঁশের টাকা দিলাম। সে মোড়া বানিয়ে বাজারে বিক্রি করলো, দেখলো অনেক লাভ। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অল্প দিনেই মহিলার ভাগ্যের পরিবর্তন হলো। আমি সে সময় শুরু করেছিলাম মোট ৮৫৬ টাকা দিয়ে। এ ব্যবস্থা স্থায়ী করার জন্য নানান ধরনের চিন্তা করলাম। এক সময় মনে হলো ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত করলে কেমন হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার স্থানীয় জনতা ব্যাংকে যোগাযোগ করলাম। ভাবলাম ব্যাংক যদি টাকা দেয় তবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তারা জানালো গরিবদের টাকা দেয়া যাবে না। তারা ঋণ শোধ করবে না। আমি বললাম, বড়লোকরাও তো ঋণ শোধ করে না। তারা বলল, তারা তো জামানত রাখে। আমার জানা ছিলো ওই ব্যাংকের বেশ কিছু ঋণ খেলাপি আছে। তো বললাম, যারা ঋণখেলাপি আছে তাদের জামানত আছে বটে, তা দিয়ে তো ঋণ উদ্ধার করতে পারোনি। এই নিয়ে শুরু হলো ঝগড়া। ভেবেছিলাম খুব সোজা হবে। হয়নি। এজিএমকে বোঝাচ্ছি, ওপরওয়ালাদের বোঝাচ্ছি। ৬ মাস ধরে চললো। ব্যাংকওয়ালারা দেখায় নিয়ম, শোনায় আইনের কথা। উপায়ন্তর না দেখে শেষে কৌশল পাল্টালাম। বললাম, আমি জামিনদার হবো। আমি সব কাগজে সই করবো। এতে আপনাদের আইন বাঁচবে। এরপরও দুই মাস লাগলো। আমি গ্রান্টার হলাম। টাকা নিলাম। ওই শুরু হলো। আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। গরিবরা টাকা কাজে খাটাবে। টাকা ফেরত দেবে। আমি সত্যি টাকা ফেরত পেলাম। ব্যাংক এ অবস্থা দেখে মন পাল্টাল না। ব্যাংক বলল, একটা গ্রামে করেছেন, আপনার ছাত্ররা খাটাখাটি করে টাকা ফেরত এনেছে, এতে কোনো কিছু প্রমাণ হলো না। পরেরবার দুটি গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা চালু করলাম। সেখানেও টাকা ফেরত এলো। ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গি এতেও বদলালো না। আমি যতোই গ্রামের সংখ্যা বাড়াই, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় না। শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আমি কথা বললাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে একটি প্রকল্প বানালাম। আমাকে বলা হলো, পুরো টাঙ্গাইল জেলায় এই কাজ করে দেখাতে হবে। আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ বছরের ছুটি নিলাম। চলে গেলাম টাঙ্গাইল। ১৩টি শাখায় ভাগ করে কাজ করলাম। চমৎকার ফল পেলাম। এর পরেও ব্যাংকের ভাষা পাল্টালো না। তাতেও তারা গরিবদের ঋণ দিতে রাজি নয়। বুঝলাম এভাবে হবে না। একটা নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তখন সরকারের সঙ্গে কথা শুরু করলাম কিভাবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ১৯৮৩ সালে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলাম। এরশাদ সরকার ব্যাংকের অনুমতি না দেয়ার জন্যে অনেক কিছু করেছে। সেই পরিস্থিতি এবং আজকের পরিস্থিতিতে অনেক তফাত। এখন এটি একটি পরিচিত ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক এখন সারা পৃথিবীতে হচ্ছে। আমাদের একটা নিজস্ব সত্তা আছে। ৭০টি দেশে শাখা আছে। অর্ধকোটি এর সদস্য। যখন শুরু করেছিলাম তখন অনেকে বলেছে, ছোট আছো ভালো আছো। ব্যাংক করতে যেও না, ঝামেলা হয়ে যাবে। আমি শুনিনি। গরিব মানুষের সামনে সুযোগটা উন্মুক্ত কর দিতে চেয়েছি।

আমি স্বভাবতই আশাবাদী। আমি মনে করি আগামী ২০ বছরের মধ্যে আমরা পৃথিবীর দৃষ্টান্তমূলক একটা অবস্থানে যাবো। আমাদের আশার কারণ আমাদের তরুণ সমাজ। তারা অজানাকে জয় করতে আনন্দ পায়

২০০০ : সুযোগ তৈরি করে দেয়ার বয়সকাল তো ৩০ বছর হয়ে গেল। এই দীর্ঘ সময়ে সেই গরিব মানুষের ভাগ্যের কতোটা পরিবর্তন হয়েছে?

ড. ইউনূস : পরিবর্তন অনেক হয়েছে। ক্রমাগত সম্পদের পরিবর্তন হয়েছে। যার কোনো গাভি ছিলো না, সে ঋণের টাকায় গাভি কিনেছে। আস্তে আস্তে টাকা শোধ করে গাভির মালিক হয়েছে। যে মহিলা এক সময় বছরে ৪-৫ হাজার টাকা লেনদেন করতেন, এখন দেখা যায় সে প্রতি সপ্তাহে ৪-৫ হাজার টাকা কিস্তি দিচ্ছে। আজকে যে ৪৮ লাখ পরিবার আমাদের সদস্য, তাদের ৫৫ ভাগ সদস্য দারিদ্র্যমুক্ত। আমরা গৃহঋণ দেই। গৃহঋণের মাধ্যমে ৬ লাখ ঘর তৈরি হয়েছে। আমরা বরাবরই উৎসাহিত করেছি তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে স্কুলে যায়। সদস্যরা দস্তখত জানতো না। তাদের বহু কষ্ট করে দস্তখত শিখিয়েছি। এতে সদস্যদের এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার মানের পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় জেনারেশনে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। এভাবে অনেক সদস্যের ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী জোনের খুবজীপুর, গুরুদাসপুর শাখার সদস্য মোছাঃ নাসিমা বেগমের ছেলে মোঃ নাসিরুজ্জামান জাপান থেকে পিএইচডি করে এসেছে।

আমরা শিক্ষা ঋণ দিয়ে থাকি। নাসিমার ছেলে নাসিরুজ্জামান শিক্ষা ঋণ নিয়েছিল। এভাবে অনেকেই শিক্ষা ঋণ নিয়ে শিক্ষিত হয়েছে। যশোরের মেয়ে নুরুন্নাহার। সে শিক্ষা ঋণ নিয়েছিল। মেয়েটা খুব সংগ্রাম করে ডাক্তার হয়েছে। তার বিয়ে হয়েছিল আগেই। এখন সে হাসপাতালে চাকরি করে। আমাদের বহু ছেলেমেয়ে এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। একটা নিরক্ষর জেনারেশন থেকে শিক্ষিত জেনারেশন তৈরি করলাম। এটা একটা বিষয়। তাদের অনেকে আমাকে বলে, লেখাপড়া তো হলো, এবার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি এবং বলি দেখো, তোমরা যদি গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শ সত্যিকারভাবে বিশ্বাস কর, তবে একটা অঙ্গীকার করবে, জীবনে কারো কাছে কোনো দিন চাকরি চাইবে না। এটা তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার হবে। উপরন্তু মনে করবে, তুমি মানুষকে চাকরি দেবে। কিন্তু বলতে পারবে না, স্যার চাকরি কোথা থেকে দেবো। আমার নিজের চাকরির ঠিকানা নেই, আপনি কি বোঝাচ্ছেন!

আমি বলি, তোমাদের অন্য বন্ধুরাও

তোমার মতো চাকরি চাচ্ছে। তোমার ও তোমার বন্ধুর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। তোমার বন্ধুর মায়ের মালিকানায় কোনো ব্যাংক নেই। কিন্তু তোমার মায়ের মালিকানায় একটা ব্যাংক আছে। কাজেই এ ব্যাংক তোমার ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক তোমার ব্যাংক। তুমি যতো টাকা চাও তোমাকে তত টাকা দেবো। এখন তোমার শুধু বুদ্ধিটা দরকার। তুমি বুদ্ধি করে আসো। তুমি পুরনো চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও। অঙ্গীকার করো আমি কারো চাকরি করবো না। না খেয়ে মরে যাবো, তবু করবো না। আমি নিজে কিছু করবো। তোমার মা নিজে রোজগার করতো। তোমার মা লেখাপড়া ছাড়াই রোজগার করেছে, আর তোমার তো লেখাপড়া আছে, তুমি কেন পারবে না? কাজেই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে লেখাপড়ার দাম আছে।

২০০০ : এই যে বোঝালেন তুমি চাকরি করো না। যাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন তারা কতোটা বুঝতে পারছে?

ড. ইউনূস : এখন এটা সেভাবে বোঝা যাবে না। কারণ এই প্রক্রিয়া কেবল শুরু হলো। কেবল তারা পাস করে বেরুলো বা বেরুনোর প্রক্রিয়ায় আছে- আরো ১০ বছর পর বোঝা যাবে। যেমন পাস করে বেরুনোর পর দেখা গেলো অনেকে চাকরি করছে। কেউ মাস্টারি করছে। তাদেরকে বললাম, কেবল চাকরি করেই হবে, নাকি অন্য কিছুও করতে হবে। ১০ জনকে বলার পর দেখা গেলো একজন বলল, স্যার আমি ব্যবসা করবো। তখন বলি ঠিক আছে, চলো করি। কতো টাকা লাগবে? এই যে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি হলো, তখন অন্যজনকে বোঝায়, দেখো ও করছে তুমিও পারবে। এ ব্যাপারটা তার মায়ের বেলায়ও হয়েছিল। তার মাকেও বলতে হয়েছে, ওই দেখো পাশের বাড়ির ময়না খাতুন ঋণ নিয়েছে এবং উন্নতি করেছে। তখন তার মাও বলেছে, না বাবা ঋণ নিয়ে আবার কী বিপদে পড়ি! কাজেই অবস্থার পরিবর্তন ধীরে ধীরে বোঝা যাবে।

২০০০ : এখন গ্রামীণ ব্যাংকের টোটাল সম্পদের পরিমাণ কত?

ড. ইউনূস : আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ রাফলি যদি বলি তবে ৬ হাজার কোটি টাকা।

২০০০ : পরিমাণটা বেশ। এই টাকা কিভাবে সংগ্রহ করলেন?

ড. ইউনূস : আমানতকারীদের কাছ থেকেই। আমরা যে পরিমাণ টাকা ঋণ দেই সেটাও এই হিসাবে আসবে। কাজেই আমানতকারীদের কাছ থেকেই এসেছে।

২০০০ : শুরুতে পরিমাণটা কতো ছিলো?

ড. ইউনূস : ওই যে ৮৫৬ টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এরপর জনতা ব্যাংকের কাছ থেকে ৮ হাজার টাকা নিয়েছিলাম। বাড়তে বাড়তে সেটা এখন কয়েক হাজার কোটি টাকা।

২০০০ : ক্ষুদ্র ঋণের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যারা কথা বলেন তারা বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার খুব বেশি। এর ফলে গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পদের পরিমাণটা বাড়ছে কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাগ্য যতোটা বলা হয় ততোটা পরিবর্তন হচ্ছে না।

ড. ইউনূস : গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পদ বাড়লে কার কাছে যাচ্ছে? মালিকের কাছে যাচ্ছে। মালিকরা ওই গ্রামীণ সাধারণ মানুষ। যারা সমালোচনা করছে তারা পেচিয়ে ফেলছে কথাটা। মনে হচ্ছে কোনো বড় লোক এসে নিয়ে যাচ্ছে টাকাটা। কাজেই সমালোচকদের কথা সত্য না। সম্পদ বেড়ে থাকলে তা তো গরিবের জন্য সম্পদ হচ্ছে। কেউ তো নিয়ে যেতে পারছে না। আমি কাজ করি, বেতন পাই। একজন পিওন চাকরি করে বেতন পাচ্ছে। সে তো সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে না। আমিও পারবো না। সম্পদ তো মালিকের থাকে সব সময়। আমাদের বাহবা দিতে হবে মালিকের জন্য সম্পদ তৈরি করে যাচ্ছি বলে।

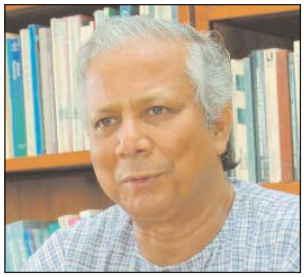

আইটির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই। মোবাইল ব্যবহার করতে শিক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মুখ। বরং আইটি ব্যবহার করলে লেখাপড়া থেকে মুক্তি দেয়া হবে। লেখাপড়া থেকে মুক্তি দেয়া কতো বড় আনন্দের ব্যাপার!

২০০০ : এখানে আর একটা প্রশ্ন আসে। আপনি বলছেন সম্পদ বাড়াচ্ছেন। এ সম্পদের পরিমাণটা যদি আর একটু কম বাড়াতেন তা হলে গ্রামের মানুষ যিনি ঋণ নেন, তার জন্যে কি ভালো হতো না?

ড. ইউনূস : সম্পদ কমলে মানুষের ভালো হয় কিভাবে, আমি বুঝলাম না। আমি তো জানি সম্পদ বাড়লে ভাগ্যের উন্নতি হয়।

২০০০ : আমি বলতে চাইছি, আপনারা এখন ঋণ দিচ্ছেন ২০% সুদে। সুদের হার যদি কমিয়ে ১০% বা ১২% করা যেতো, তাহলে কি দরিদ্র মানুষ আরো বেশি উপকৃত হতেন না?

ড. ইউনূস : হ্যাঁ, এটা করলে লাভ হতো। তাৎক্ষণিক লাভ হতো। তবে তা ভালো হতো না। আপনি যেটা বলছেন আমিও সেটা জানি। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার নিয়ে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। গরিব মানুষের জন্য যে ব্যাংক সে ব্যাংক গরিব মানুষকে স্বল্প সুদে ঋণ দেবে এটাই অনেকে আশা করেন। লোকসান হলে হোক, তবু গরিব মানুষ স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে উপকৃত হবে। যারা এমনটা ভাবেন, তাদের পাশাপাশি এটা হিসাব করতে হবে, গ্রামীণ ব্যাংক শুধু গরিবের ঋণ দেয়ার জন্য নয়, তারা এই ব্যাংকের মালিক। ব্যাংক লোকসান দিলে তাদের আম ও ছালা একসঙ্গে যাবার দশা হবে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার গ্রামীণ ব্যাংকে সর্বনিম্ন। সরকারের নির্ধারিত ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ফ্ল্যাট রেট ১১ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা প্রায় ২২ শতাংশের সমান। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন এনজিওদের ঋণের বর্তমান সুদের হার ফ্ল্যাট রেট ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ করার জন্য প্রস্তাব করে। প্রস্তাবটি সম্প্রতি করা হয়েছে। এতে ফ্ল্যাট রেট ২৩ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে দাঁড়ায়। পি. কে. এস. এফ যদি সফল হয় তবু এই হার গ্রামীণ ব্যাংকের হার থেকে ৫ শতাংশ উপরে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার সর্বনিম্ন।

আর একটা ব্যাপার, ২০ শতাংশ হারের সুদ ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের আরও তিন প্রকার সুদের হার আছে। গৃহঋণে ৮ শতাংশ, শিক্ষাঋণ ৫ শতাংশ এবং ভিক্ষুকদের জন্য সুদবিহীন ঋণ। ২০ শতাংশ থেকে সুদের হার কমালে, বাকি তিন ধরনের সুদের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে হবে। দেখা যাবে ভিক্ষুকদের ঋণের ওপর সুদ ধরতে হবে, নয়তো গৃহঋণ অথবা শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণে সুদ বাড়াতে হবে।

আর একটা বিষয় হলো, গ্রামীণ ব্যাংকে রক্ষিত আমানতের ওপর সুদের হারের কথাও বিবেচনায় আনতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের ৯৯ দশমিক ৯১ শতাংশ আমানতই সঞ্চয়ী আমানত। যার সর্বনিম্ন সুদের হার ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। সর্বোচ্চ সুদের হার ১২ শতাংশ। মোট আমানতের পরিমাণ ১ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ আদায়যোগ্য টাকার ৯৪ শতাংশই আসে আমানত থেকে। আর এই মোট আমানতের ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা সদস্যদের নিজেদের আমানত। সুদের হার যদি ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে আনতে হয়, তবে অবশ্যই আমানতের হার এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে কমাতে হবে। চলমান প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের আমানত ৭ বছরের দ্বিগুণ হয়। কিন্তু ওই প্রক্রিয়ায় ৭ বছরে দ্বিগুণ না হয়ে ১২ বা ১৪ বছরে হবে। এতে গরিব মানুষের সঞ্চয় করার আগ্রহ কমে যাবে।

গ্রামীণ ব্যাংকের একটি প্রকল্প পরিদর্শন কালে হিলারি ক্লিনটন ও তার কন্যা চেলসির সাথে ড. ইউনস

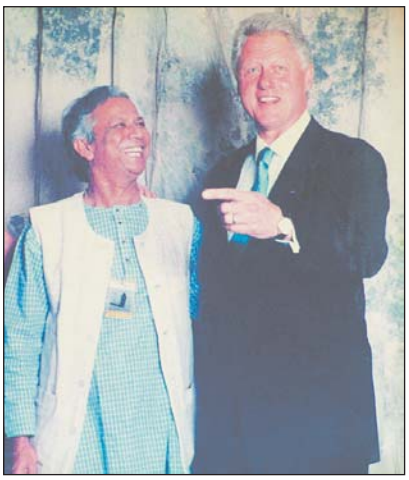

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সঙ্গে

গরিব পরিবারের, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে সম্পদ গড়ে তোলা গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্যগুলোর একটি। আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ দিয়ে তাদের আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই উচ্চহারে সুদ পাবার জন্য ঋণের ওপর উচ্চহারে সুদ দিতে হলে তাতে তারা আপত্তি করে না। বরং বলে, বর্তমানের পরিশ্রমের ওপর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩ জন বোর্ড সদস্যের মধ্যে ৯ জন হলেন সদস্যদের প্রতিনিধি। তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেকবার আলাপ করেছি। ঋণগ্রহীতা মালিকদের সমর্থনের ভিত্তিতে আমরা সুদ-কাঠামো তৈরি করেছি।

গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো সদস্য মারা গেলে তার ঋণের অর্থ ফেরত দিতে হয় না। উপরন্তু সঞ্চয় তহবিলের টাকা ফেরত পেয়ে যায় তার পরিবার। এই সঞ্চয় তহবিলের টাকার ওপর ব্যাংক ১২ শতাংশ হারে সুদ দেয় বলে বর্তমানে যে হারে এই সঞ্চয় তহবিলে টাকা জমা দেয়া হয়, তাতে বছরে যত ঋণগ্রহীতা মারা যান (গড়ে ৬ হাজার) তাদের বকেয়া ঋণ এই তহবিলের সুদের আয় দিয়ে পরিশোধ করে দেয়া যায়। যদি সুদের হার কমিয়ে দেয়া হয় তাহলে এখানেও প্রভাব পড়বে।

বেসরকারি ব্যাংক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ ব্যাংক গোড়া থেকে সরকারি বেতন কাঠামো হুবহু মেনে চলে।

২০০০ : অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ যারা সমালোচনা করেন, তারা কিন্তু খুব জোর দিয়েই বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার বেশি। তাদের এই সমালোচনার জবাব কী?

ড. ইউনূস : আমি এ প্রশ্নের জবাব দিই এভাবে, মুখে অনেক কথা বলা যায়। আমাকে করে দেখাতে হবে। এটা তো একটা বাজার। আমি তো একচ্ছত্র অধিপতি না। এইসব ওয়াজ না করে, আপনি করে ফেলেন। আপনি যদি প্রফেসর হন তাতে কোনো সমস্যা নাই। আমিও প্রফেসর ছিলাম। কাজেই এ ব্যবসা করতে লজ্জা হওয়ার কথা নয়। ২০ শতাংশের জায়গায় ১০ শতাংশ সুদ নিয়ে যদি পারেন করে দেখান। আমি বাহাবা দেবো। সালাম দেব। সমালোচনা নয়, কাজ করে দেখিয়ে তারপর বলতে হবে, সুদের হার কমিয়ে ভালো কিছু করেছি। ডাঙায় দাঁড়িয়ে, পানি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সাঁতার কিভাবে কাটতে হয় সেটা বলার কোনো অর্থ হয় না। পানিতে নামেন, সাঁতার কাটেন তখন দেখা যাবে। বড় আকারে না পারেন ছোট আকারে করেন। আর যদি না করেন তবে বলতে হয় গলাবাজি করবেন না। ফাইন্যান্স মিনিস্টারও বলেন সুদ কমানোর কথা। আসলে বলতে হয় বলেই বলেন। এসব কথার কোনো অর্থ হয় না।

২০০০ : বলা হয় দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা উদ্দেশ্য নয়, দরিদ্রদের আরো ঋণগ্রস্ত করাই লক্ষ্য।

ড. ইউনূস : এই লক্ষ্যের লাভটা কী? তাতে আমাদের সন্তুষ্টিটা কী? একটা লোককে গরিব করে রাখলাম, ঋণগ্রস্ত করে রাখলাম এতে আমার-আপনার কী লাভ হবে? অন্য ব্যবসা করে কি আমাদের রোজগার কম হতো বলে মনে করেন? আসলে ওগুলো অযৌক্তিক কথা। এই যে এতক্ষণ বললাম, দারিদ্র্যমুক্ত হচ্ছে, গরিবের ছেলে শিক্ষিত হচ্ছে, সম্পদ বাড়ছে। এগুলো এলো কোথা থেকে? তাহলে প্রমাণ করেন এসব মিথ্যা। সেটাও তো পারবেন না।

২০০০: বড় একটা দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখনো আপনাদের আয়ত্বে আসেনি, তারা সুবিধা বঞ্চিত..

ড. ইউনূস : এই কথাটা ভুল। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণ এত সম্প্রসারিত যে, বলা যায় ৮০/৯০ ভাগ দরিদ্র মানুষ ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় এসেছে। এতে হয়তো সবাই বড়লোক হয়নি। তবে দৈনন্দিন জীবন সহজ হয়েছে। আমাদের এটাই সান্ত্বনা। আগে একবেলা খেলে এখন দুবেলা খায়। আগে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতো না। এখন পাঠায়। আমাদের এটাই সান্ত্বনা। সরকার তো বহু টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে খরচ করছে। সফলতা আমাদের কি বেশি নয়? সরকার তো টাকা ফেরত পায় না। আমরা ফেরত দিয়ে আসি।

২০০০ : ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে একটা বিষয় আছে। বলা হয় টাকা ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে আপনারা গলায় পাড়া দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন। দেখা যায় ঋণগ্রহীতার সুদের টাকা ফেরত দিতে ভিটেমাটি পর্যন্ত হারাতে হয়।

ড. ইউনূস : এইসব বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে আসেনি। উনাদের দৃষ্টিতে পড়তে পারে। উনারা হয়তো ঘরে বসে এসব চিন্তা করছেন। গরিবরা আমাদের অফিসে এসে টাকা নিয়ে যায় কিংবা ফেরত দিতে আসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় সময় একা একা ঋণগ্রহীতাদের বাড়ি যায়। সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যায় না। আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখলেই গ্রামের লোকেরা সালাম দেয়। যদি তারা গলায় পাড়া দিয়ে টাকা নিয়েই যায়, তবে বাংলাদেশ

কি এমন হয়েছে যে যখন যা ইচ্ছে করবেন কেউ কিছু বলবে না? ঋণ গ্রহীতার স্বামী আছে, পাড়া-প্রতিবেশী আছে, সমাজ আছে, কেউ কি কিছুই বলবে না? আর এই প্রক্রিয়ার ব্যাপার তো একদিনের না। বছরের পর বছর চলছে।

অবশ্য আমাদের যে সবাই ভালোবাসে তা নয়। মওলানারা অপছন্দ করে, মহজনীরা আমাদের অপছন্দ করে। আগে যাদের বাসায় ওই গরিব মহিলারা কাজ করত এখন করে না। তারা আমাদের বিরোধিতা করে। যদি আমাদের ব্যবস্থা লোকজন পছন্দ না করতো তবে এক্সপ্লর করতো। মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিতো। তা তো হয়নি। আমরা যদি গায়ে হাত দিতাম, বিশেষ করে মেয়েদের গায়ে, লোকজন আমাদের ছেড়ে দিতো? গরিব মেয়ের ওপর নির্যাতন কেউ মানতো না। সমালোচকরা যা বলছে তা নিতান্তই মনগড়া। ঘরে বসে বসে বানায়। এটা বানালে সুন্দর লাগে। মাঝেমধ্যে দু-একটা খবর আমরা এমন দেখি, এনজিও থেকে নেয়া ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে গলায় ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন। এরকম সংবাদ পত্রিকায় এলে আমরা খোঁজ নেই। ঘটনা খুঁজতে গিয়ে দেখি পত্রিকায় আসা মহিলা তো দূরের কথা, গ্রামটাই খুঁজে পাই না। আবার দেখা যায় কোনো মহিলা আত্মহত্যা করেছে পারিবারিক কলহের কারণে। সে কখনো গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যই হয়নি। এখন কোনো মহিলা ফাঁসি নিলেই যদি এমন কথা বলা হয়, তবে বলার কী আছে! আমাদের গ্রামবাংলার মহিলারা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে আত্মহত্যা করেছে, দেখা গেলো সে কোনো এনজিওর সদস্য। তাহলে কি বলব, ঋণ শোধ করতে না পারায় আত্মহত্যা করেছে?

২০০০ : এরকম কি দেখা যায় গরিব মহিলারা এক এনজিও থেকে টাকা নিয়ে আরেক এনজিওকে কিস্তির টাকা শোধ দেয়? দেখা গেলো ব্র্যাকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে গ্রামীণের ঋণের কিস্তি দিচ্ছে। আবার আশা থেকে নিয়ে ব্র্যাকের কিস্তি দিচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এরকম দৃশ্য কি চোখে পড়েনি?

ড. ইউনূস : এনজিওর সংখ্যা বেড়েছে। দেখা যায় তারা আশা থেকে নিচ্ছে, ব্র্যাক থেকে নিচ্ছে, গ্রামীণ থেকে নিচ্ছে এবং শোধও করছে। যদি রোজগার করে এটা করে থাকে অসুবিধা কী? আর যদি রোজগার না করে এটা করে থাকে তবে এক সময় আটকে যাবে। এরকমটা তো হচ্ছে না। আমাদেরটা শোধ করছে, অন্যদেরটাও করছে। একটা লোকের ২০ হাজার টাকা লাগবে। গ্রামীণের কাছ থেকে দেখা গেলো ৫ হাজারের বেশি পাবে না। সে আরো ৩/৪টি এনজিও থেকে নিয়ে তার ২০ হাজার পূর্ণ করে ব্যবসা করছে। আমাদের সব এনজিওদের আদায়ের অবস্থা যদি ভালো হয়, তবে অসুবিধা কোথায়?

২০০০ : যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব ব্যক্তিদের কি ঋণ দেন?

ড. ইউনূস : আমাদের বলা হতো, গরিবদের একটা লেবেলকে ঋণ দিয়ে থাকি। কথাটা ঠিক নয়। আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমরা ভিক্ষুকদেরও ঋণ দেই। শূন্য সুদে ৪৫ হাজার ভিক্ষুককে এখন ঋণ সুবিধা দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে এই সংখ্যা আরো বহুগুণ বাড়াতে পারি। আমার স্টাফরাও সংখ্যা বাড়াতে চায়। কিন্তু এ মুহূর্তে বাড়াতে চাই না। আমি দেখতে চাই এই ভিক্ষুকদের জীবনমানের কতখানি পরিবর্তন আনতে পারি।

ভিক্ষুককে ঋণ দেয়ার সময় একটা বিষয় গুরুত্ব দিই তা হলো, সর্বোচ্চ কঠিন ভিক্ষুককে আওতায় আনতে চেয়েছি। অর্থাৎ যে বংশ পরম্পরা ভিক্ষা করছে, তাকেই প্রথম টার্গেট করতে বলেছি।

একজন ভিক্ষুককে বলেছিলাম, তুমি প্রতিদিন কত আয় করো? সে বলল, কোনো দিন ১ কেজি কোনো দিন ২ কেজি চাউল পাই। তাই দিয়ে খাই। আমি বললাম, আপনি ভিক্ষার পাশাপাশি ব্যবসা করার সুযোগ পেলে করবেন? সে বলল, করবো। তাকে অল্প কিছু টাকা দিলাম। সে চকলেট, বাচ্চাদের খেলনা কিনে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। দেখা গেলো কোনো বাড়িতে জিনিস কিনছে না, ভিক্ষে দিচ্ছে। আবার কোনো বাড়িতে ভিক্ষে দিচ্ছে না, জিনিস কিনছে।

ঘোড়ার শক্তি ইত্যাদি নিয়ে যে প্রাণী বানাবে তা দেখা যাবে উঠেও দাঁড়াতে পারছে না। প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা ইন্টারনাল কনজেস্টি থাকে। ওর ভেতরেই তাকে দেখতে হবে।

এভাবে ওই ভিক্ষুক যদি ব্যবসা করতে করতে ভিক্ষা ছেড়ে দেয় তো ভালো। আমার বিশ্বাস, ভিক্ষুকরা এক সময় আত্মসম্মান ফিরে পাবে। তখন আর ভিক্ষা করবে না।

এ তো গেল চলমান ভিক্ষুকদের কথা। কিন্তু যে চলতে-ফিরতে পারে না, ল্যাংড়া প্রতিবন্ধী তার কী হবে? প্রসঙ্গটি আমাদের একজন স্টাফ তুললেন। ও তো এক জায়গায় বসে ভিক্ষা করে। আমি অনেক ভাবলাম। শেষে বুদ্ধি বের হলো। বললাম, ওই ভিক্ষুক যদি কিছু কলা বা মুড়ি-চানাচুর নিয়ে বসে। অর্থাৎ ভিক্ষাও করল, বসে বসে ব্যবসাও করল। কারণ ভিক্ষুক নিশ্চয় রাস্তা বা বিশেষ জায়গায় বসে যেখানে লোকসমাগম হবে। এতে তার ভিক্ষা ও ব্যবসা একসঙ্গেই চলতে পারে। এরপর ব্যবসা ভালো হলে ভিক্ষা নিশ্চয় ছেড়ে দেবে।

এই ভিক্ষুকদের আমরা যে ঋণ দিচ্ছি এতে কোনো শর্ত নেই। সে যেদিন ইচ্ছা শোধ করবে। কোনো সুদ দিতে হবে না। অন্যরা সপ্তাহে কিস্তি দেয়, ভিক্ষুকদের তা দেয়া লাগবে না। আমরা বলি, ঋণ শোধ করলে আবার ঋণ পাবে। ঋণ শোধ না করলে আর পাবে না। কয়েক দিন আগে মাধবদী গেলাম। সেখানে ৪০ জন ভিক্ষুককে নিয়ে বসলাম। সবার এক কথা। ব্যবসা খুব সুন্দর চলছে, শুধু টাকাটা বাড়িয়ে দেন।

আমরা ওই ভিক্ষুকদের ৫০০ টাকা করে দিয়েছি। আমি বললাম, বেশি দিলে আপনাদের বোঝা বেড়ে যাবে। ঋণ শোধ করতে পারবেন না। তারা বললো, স্যার, আমরা সপ্তাহে ১০ টাকা করে শোধ দিই, আরো ১০ টাকা বেশি করে জমা দিই। আমি আবার বললাম, বেশি দেন কেনো। সে বললো, আমারা জমাই। ওই ভিক্ষুক বিগত ৪ মাস ধরে কিস্তিতে টাকা জমা দিচ্ছে। ৬ মাসে ৫০০ টাকা শোধ করবে। আমি বললাম, এই চার মাসে কত জমালেন। সে উত্তর দিতে পারে না। অনেকক্ষণ পর বলে, যেদিন ৫০০ শোধ হবে, সেদিন ৫০০ টাকা জমা থাকবে। আমি তো থ' ভাবলাম সাংঘাতিক কথা। আমি তো এভাবে ভাবিনি! সে যখনই ১০ টাকা শোধ করেছে তখনই ১০ টাকা জমা রেখেছে। ওই ৪০ জন মহিলা ভিক্ষুককে বললাম, সরকার তো বহু রকম সুবিধা দেয়। ভিজিডি কার্ড দেয়, গম দেয়, টাকা দেয়; বয়স্ক ভাতা দেয়। আপনারা কি পান। তারা জানালো, গ্রামের মেম্বাররা তাদের আত্মীয়দের দেয়। এক মেম্বার নাকি তার চাচিকে বয়স্ক ভাতা দেয়। ভিক্ষুককে মেম্বার বলে, তুমি তো ভিক্ষা করে খাও। চলে-ফিরে বেড়াতে পারো। চাচীতো বের হতে পারে না। তাই বয়স্কভাতা তারেই দিচ্ছি। তবে তোমার প্রয়োজন হলে সপ্তাহে শুক্রবার করে চাল নিয়ে যেয়ো। এর মধ্যে আরেকজন ভিক্ষুক বললো, বয়স্ক ভাতা পাবো কি, এইডা বললেই ৫০০ টাকা দিতে হয়। স্যার আমরা ৫০০ টাকা পাব কই, ঐ টাকা পাব কেমন করে।

আমরা উপরে উপরে বলছি গরিবদের ভাতা দিচ্ছি, ভিজিডি কার্ড দিচ্ছি। গ্রাম সরকারের মহিলা সদস্যরা বলে, কই আমাদের তো ভিজিডি কার্ড দেওয়ার সময় আমাদের সঙ্গে শালাপরামর্শ করে দেয় না। লিস্টি হয় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মধ্য থেকে। আমাদের তো কিছু বলে না। এই হলো একটা এলাকার চিত্র। সারা দেশের চিত্র কি এর থেকে আলাদা? মোটেই না।

২০০০ : এই একটা চিত্র দেখেই বোঝা যায়...

ড. ইউনূস : হ্যাঁ, দেশের অবস্থা এ থেকে বোঝা যায়। তবে প্রশ্ন করেছিলেন, একেবারে নিঃস্বদের ঋণ দেই কি না। ভিক্ষুকদের নিচে তো আর কেউ নাই। গরিবের দিক থেকে ভিক্ষুকের পরে আর কেউ আছে কি?

২০০০ : গ্রামে আর একটি শ্রেণী আছে। যাদের এক সময় ভিটেবাড়ি ছিলো। এখন নেই। দিনমজুরি করে খায়। এই শ্রেণীর সংখ্যা তো একেবারে কম নয়। এদের জন্যে তেমন কিছু করছেন না কেন?

ড. ইউনূস : ভিক্ষুকদের সঙ্গে কাজ করতে পারলে ওদের সঙ্গে পারব। তাদের তো কোনো বাধা নাই। আমাদের নিয়ম হলো, যে যত বেশি গরিব, সে তত বেশি অগ্রাধিকার পাবে।

২০০০ : আমরা একটু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি। বিশ্বব্যাংকের টাকা না নেয়ার কারণ কী? বিশ্বব্যাংক একবার এক শতাংশের কম হারে আপনাদের টাকা দিতে চেয়েছিল। আপনি তখন টাকা নেননি। অথচ যতদূর জানি, আপনাদের তখন টাকার প্রয়োজন ছিলো।

ড. ইউনূস : আমরা নিইনি। ফেরত দিয়েছি। ওয়াশিংটন থেকে প্রতিনিধি এসেছিলো, কেন টাকা নিচ্ছি না জানতে। আমি বলেছি, তোমাদের টাকা নেব না। কারণ তোমরা যে শর্ত জুড়ে দেবে তা আমাদের কাজে প্রতিবন্ধক হতে পারে। পুরো কাজটাই ভেস্তে যেতে পারে। তখন সে প্রতিনিধি বলেছিল, আমি লিখিত দেবো কোনো শর্ত পালন করতে হবে না। আমি তাকে প্রশ্ন করি তুমি এই ডিপার্টমেন্টে কতদিন ধরে আছো? সে বললো, ২ বছর ধরে আছি। এর আগে আমি অমুক যায়গায় ছিলাম। বললাম, দেখো আমি যখন টাকা নেবো, দেখা গেলো তুমি বদলি হয়ে চলে গেলে। তখন নতুন যে আসবে সে এসে বলবে, আমি ওসব চুক্তি বুঝি না, আমার আগেরজন যা করেছে তা পাগলামি। ব্যাংকের আইন মেনে চলতে হবে। তখন তো আমি বেকায়দায় পড়ব।

আর আমার চাইতে তোমাদের গলা অনেক বড়, সেখানে আমি চুক্তি নিয়ে যাই বলি, আমার গলা ছোট হওয়ায় আমার কথা কেউ শুনবে না। দেখা গেলো বিশ্বব্যাংক সরকারকে অভিযোগ করল। সরকার আমার কাছে টেলিফোন করল কিংবা লোক পাঠিয়ে বললো, হ্যাঁ একি করছেন। বিশ্বব্যাংকের টাকা নিয়ে তাদের শর্ত মানছেন না। আমাদের দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। কাজেই ভাই, আমরা এ রিস্ক নিতে চাই না। আমরা আমাদের মতো অগ্রসর হই। আমি মনে করি তাদের এই চাপের থেকে দূরে থাকাই ভালো। এতে মনে হয় না আমরা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি।

২০০০ : এখানে একটা বিষয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ কিংবা অন্য সংস্থা থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থ আনার জন্য এহেন কিছু নাই যা আমরা করি। নতজানু হয়েও করি। বিভিন্ন প্রকল্পের নামে সরকার টাকা নিয়ে এসে কাজ করছে। আপনারা তো মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন। আপনারা যেখানে সফল হচ্ছেন, সরকার সেখানে সফল না হওয়ার কারণ কী?

আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। গরিবরা টাকা কাজে খাটাবে। টাকা ফেরত দেবে। আমি সত্যি টাকা ফেরত পেলাম। ব্যাংক এ অবস্থা দেখে মন পাল্টাল না। ব্যাংক বলল, একটা গ্রামে করেছেন, আপনার ছাত্ররা খাটাখাটি করে টাকা ফেরত এনেছে, এতে কোনো কিছু প্রমাণ হলো না

ড. ইউনূস : সরকারের কাজগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এর প্রধান কারণ ব্যবস্থাপনায় গলদ। এই গলদটা এত বড় যে, যাই করতে যাই না কেন, তা ঠিকমতো হয় না। ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা শুধু যে ইমপিলিমেনটেশনে হয় তা নয়, ওই যে কিসের জন্য টাকা নেয়া সেটাই ঠিক করতে পারি না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের কন্‌সালটেন্ট এসে প্রজেক্টটি বানিয়ে দিয়ে যায়। অনেক সময় পুরো ডকুমেন্ট পড়ারও সুযোগ হয় না। পড়লেও সব জিনিস যে বুঝতে পারছি তা নয়।

২০০০ : বোঝার যে চেষ্টা করা, সেটাও করি না।

ড. ইউনূস : হ্যাঁ। বোঝার চেষ্টাও করি না। চেষ্টা করলে তো বুঝতাম। সেই টাকাটা কিভাবে আবার আদায় করে নেবে, সেটা দেখিও না। শুধু এতো কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে এটাতেই মশগুল ছিলাম। টাকাটা নিয়ে নিয়েছি। নেয়ার পর বুঝলাম যে বড় কঠিন কঠিন শর্ত। ফলে এখান থেকেই গণ্ডগোলোর সূত্রপাত। টাকা যেটা পাচ্ছি সেটারও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছি না। সে কারণে প্রথমেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কী চাই। চাওয়াটা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সে ব্যাপারে পরিষ্কার পরিকল্পনা বানাতে হবে। চাপ দিলেই যে মেনে নিতে হবে তা না। আমরা যদি বোঝাতে সক্ষম হতামই আমরা পারব, আমাদের কনসালটেন্ট প্রয়োজন নেই। আমাদের সমস্যা আমরাই সমাধান করতে পারবো। প্রথম প্রথম হয়তো অসুবিধা হতো, টাকা ছাড় হয়তো কম হতো। তার পরেও যদি দু-একবার প্রমাণ করতে পারতাম আমরা লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি, তাহলে তারাও নমনীয় হতো। তারা বলতো, ওরা তো নিজেরাই পারে, তখন কনসালটেন্ট আর পাঠাতো না। কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি। বারবার ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি, তাদের বানিয়ে দেয়া গর্তে আমরা পড়েছি। আমরা এভাবেই নিজেদের অযোগ্য প্রমাণ করেছি।

২০০০ : বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য দূর করার নামে যে কাজ করছে তাতে প্রকৃত অর্থেই দারিদ্র্য দূর হচ্ছে না। তাদের প্রকল্পে সমস্যা আছে। এ বিষয়টি কি বিশ্বব্যাংক বোঝে? তারা কি ইচ্ছে করেই এ জাতীয় প্রকল্প আমাদের মতো গরিব দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়?

ড. ইউনূস : তারা মনে করে না তাদের সিস্টেম খারাপ। তারা মনে করে তাদের সিস্টেম অত্যন্ত ভালো। এ ছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব না। তাদের ধারণা, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে হবে। যাতে করে দুর্নীতি এখানে ছুঁতে না পারে। ওদের ধারণা মতো এটা ভালো। কাজেই আমি বলব না তারা জেনেশুনে একটি খারাপ কাজ করছে। কিন্তু যেটা আসছে তা আমাদের জন্য খারাপ হচ্ছে। এ ব্যাপারটা তাদের বোঝাতে হবে। তাদের বোঝালে যে বুঝবে না এমনটা নয়। কারণ আমাদেরও প্রতিনিধি আছে বিশ্বব্যাংকে। কাজেই একচ্ছত্রভাবে এসে পড়ছে তাও নয়। আমাদের অলটারনেটিভ ডিরেক্টর সেখানে বসে আছে। আর এখন বিশ্বব্যাংকের যে পদ্ধতি তাতে মূল পলিসি মেকিং ঢাকায় হয়, ওয়াশিংটনে না। কাজেই ডিরেক্টরের ক্ষমতা অনেক বেশি। আগে এমনটি ছিল না। কাজেই এখানে যারা কাজ করছে তাদের বোঝাতে পারি, ভাই এটা আমাদের মঙ্গল হবে না। তাদের যদি কনভিন্স করতে পারি, তবে না মানার তো কোনো কারণ নেই।

২০০০ : আমরা দুর্নীতির কথা বলছি, বুঝলাম বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। তবে আমরা কি এই অভিযোগ করতে পারি না, বিশ্বব্যাংক নিজেই দুর্নীতি সৃষ্টি করে দিচ্ছে? আমি আমলা, আমাকে বাড়তি সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। কনফারেন্সের সুযোগ-সুবিধার নামে ঘুষ দিচ্ছে। তাহলে কি বলব না বিশ্বব্যাংকের মূল আদর্শে গণ্ডগোল আছে? তারা চাচ্ছে না আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হোক।

ড. ইউনূস : সেটা আমি বলব না। বিশ্বব্যাংক চাচ্ছে না আমার ভাগ্যের উন্নতি হোক। তাহলে অনেক আগে ব্যাংক বন্ধ করে দিতে হতো। কারণ এই বিশ্বব্যাংক কারো একক সৃষ্টি না। হয়তো গলদ আছে। দুর্নীতি বিশ্বব্যাংক নিজে থেকে করে না। দুর্নীতি ব্যক্তি হিসেবে করে। কোনো ব্যক্তি যদি তা করে আর ধরা পড়ে তবে তার শাস্তি হবে। এটাই নিয়ম। আমাদের এখানে যেটা হয়, ধরা পড়লেও শাস্তি

হয় না। এখানেই গণ্ডগোলটা লেগেছে। ধরাও পড়ে না; পড়লেও তার শাস্তি হয় না। বিশ্বব্যাংক এতো সুন্দর ভাষায় করছে তা ধরা যায় না। সে এমনভাবে করছে দেখাচ্ছে আমলার ট্রেনিংয়ের জন্য, তার কাজের সুবিধার জন্যে বিদেশের জন্যে বিদেশের কনফারেন্সে যাওয়ার প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক বলবে এটা ঘুষ বা দুর্নীতি নয়। সবই তো কাগজপত্রে আছে। কিছু তো গোপন করি নাই। দুর্নীতি তো গোপনে হয়। তারা বলবে, আমি তো দলিলও দিয়েছি। তোমারা পরীক্ষা করেছ, তোমরা বলেছ ঠিক আছে। তুমি করতে রাজি হয়েছ আমাকে দোষ দিয়ে তো লাভ নাই। আমি তো তোমার ভালোর জন্য করেছি।

২০০০ : করতে না চাইলে...

ড. ইউনূস : এটা তোমার বিষয়, তুমি অ্যাটেন্ড করবে কি করবে না। আমি সাজেস্ট করেছি। আমরা মনে করেছি দশ দেশের কথা শুনলে কাজে সুবিধা হতে পারে। রাজি হয়েছে বলে করেছি।

২০০০ : বিশ্বব্যাংক পরেও একবার বড় অঙ্কের টাকা দিতে চেয়েছিল, আপনারা নেননি। সেই টাকা চলে গেছে শ্রীলঙ্কায়।

ড. ইউনূস : বিশ্বব্যাংক আমাদের নয়, সরকারকে দিতে চেয়েছিল। তারা একটি নতুন মডেল তৈরি করতে চেয়েছিল। তারা বলল, সব মডেলের ভালো ভালো দিক নিয়ে একটি নতুন মডেল বানাবে। আমি বললাম, হরিণের চোখ, ঘোড়ার শক্তি ইত্যাদি নিয়ে যে প্রাণী বানাবে তা দেখা যাবে উঠেও দাঁড়াতে পারছে না। প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা ইন্টারনাল কনজেস্টি থাকে। ওর ভেতরেই তাকে দেখতে হবে। আমরা সরকারকে বিশ্বব্যাংকের এই টাকা নিতে নিষেধ করলাম। সরকার আমাদের কথা শুনলো। বললাম, তার চাইতে আমরা একটি ফাউন্ডেশন বানাবো শুধু ক্ষুদ্র ঋণ প্রসারের জন্য। এনজিওরা জানে কি করতে হবে। শুধু তাদের হাতে টাকা নেই বলে করতে পারে না। ফলে টাকার ব্যবস্থা হোক এরকম একটি লিখিত প্রস্তাব দিলাম। সরকার প্রস্তাব গ্রহণ করলো কোনো বিদেশী আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই রূপরেখা তৈরি করলাম। আর সেটাই হলো আজাকের পল্লী কর্মী সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফ। সরকার প্রথমে ১০ কোটি টাকা দিল। পরবর্তীতে সাইফুর রহমান সাহেব এলেন, তিনি আরো টাকা দিলেন। অনেক বছর যাওয়ার পরে বিশ্বব্যাংক বলল, আমরা কিছু টাকা দেবো। আমি বিশ্বব্যাংকের কোনো টাকা নিতে দিই নাই। কাজ খুব সুন্দরভাবে চলছিল। বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্ট হয়ে বহু চাপাচাপি করলো। শেষে বললাম, তোমরা টাকা দিলে কোনো শর্ত দিতে পারবে না। চুপচাপ টাকা দেবে। কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। বিশ্বব্যাংক তাতেই রাজি হলো। এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাংককে কোনো প্রশ্ন তুলতে দিই নাই। প্রশ্ন তুললেই তাদের আগের কথা স্মরণ করিয়ে দিই। ওয়াহেদ উদ্দিন মাহমুদ এখন চেয়ারম্যান। তিনি বড্ড কড়া মানুষ কোনো প্রশ্ন তুললেই তিনি বলেন, তোমাদের টাকা ফেরত দিয়ে দেবো। এই সুদের হার সাড়ে ১২ শতাংশ করা হলো। বিশ্বব্যাংক বহু তোলপাড় করছে। তারা এনজিওদের বাধ্য করছে সুদের হার কমাতে। তারা যা ইচ্ছা সুদ নেবে। আমি বলেছি না। আমরা ডোনার, তোমরা যেমন বল, লোন কন্ডিশন দিয়ে দাও, ক্ষমতা দেখাও। পিকেএসএফ একটি ডোনার, সে লোন দিচ্ছে, সুতরাং লোন কন্ডিশন ঠিক করার দায়িত্ব তাদের। কাজেই যে আমাদের টাকা নেবে তাকে এই হারে সুদ দিতে হবে।

২০০০ : আসলে বিশ্বব্যাংকের দোষ দিয়ে লাভ নাই। দোষ আমাদের...

ড. ইউনূস : অ্যাকজ্যাক্টলি। দোষ আমাদের। আমরা বোঝাতে পেরেছি। তারা পিকেএসএফের আগামী ১০ বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে বলেছিল, অনেক বিষয়ে এসেছে, একজন কনসালটেন্ট পাঠাই। আমি বললাম, এটা কি বললে? আবার সেই কনসালটেন্ট। তারা বলল, তোমাদের সময় হবে কি না- আমি বললাম, পিকেএসএফ আমাদের স্বপ্ন। এক পাতার পরিকল্পনা হলেও আমরাই তৈরি করবো। আমাদের ভাষা তোমাদের পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। আমাদের স্বপ্ন আমাদের ভাষায় হবে। আমাদের স্বপ্ন তোমাদের লোক এসে দেখিয়ে দিয়ে যাবে, এটা আমাদের দরকার নেই। এভাবে আমরা ২০০০ সালে একটি কর্মপরিকল্পনা করলাম। তাদের দিলাম। বললাম, তোমার পছন্দ হোক আর না হোক; এটা আমাদের স্বপ্ন, আমাদের মতোই করেছি। এতে টাকা দাও আর নাও দাও তোমাদের ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপার তার কোনো টুঁ শব্দ করেনি। বলেছে তোমাদের কত লাগবে?

২০০০ : শ্রীলঙ্কায় যে মডেল বিশ্বব্যাংক করেছিল তার অবস্থা কী?

ড. ইউনূস : নষ্ট হয়ে গেছে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কান সরকার মডেল বাতিল করে দিয়েছে।

২০০০ : আবার অন্য প্রসঙ্গে আসি, আপনি স্থানীয় সরকার নিয়েও কাজ করেছেন। স্থানীয় সরকার সহায়ক গ্রুপ গঠন করেছিলেন ২০০২ সালে। বর্তমানে ওই গ্রুপের অগ্রগতি কতখানি?

ড. ইউনূস : এই গ্রুপ এখন আর অ্যাকটিভ নেই। কনফারেন্স করলে পয়সাকড়ি লাগে। আমরা ঠিক করেছিলাম দাতাদের কাছ থেকে কোনো টাকা-পয়সা নেব না। আর দাতাও তেমন পাওয়া যায়নি। একটা মিটিং করলে চা-পানি খাওয়াতে হয়। কে দেবে এ খরচ। এ কারণে হয়নি। আর যারা ছিল তারাও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলা যায়, স্থানীয় সরকার নিয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল তা মৃতপ্রায়।

২০০০ : একটি দেশের উন্নতির জন্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

ড. ইউনূস : অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে দেশের উন্নতি হবে। আমি সব সময় গুরুত্ব দিয়েছি স্থানীয় সরকার কার্যকর হোক, শক্তিশালী হোক। কিন্তু আমি অবাক হলাম, যখন দেখলাম এবারের বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদে থোক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ লাখ করে। অথচ অনেকে তার নেগেটিভ সমালোচনা করছে। পত্রিকায় খবর এলো নির্বাচনের সময় ২ লাখ টাকা করে দিয়ে এটা ওটা কিনে দেয়া হচ্ছে। আমরা বরাবরই আন্দোলন করে আসছি, স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দ বাড়ানো হোক, রেভিনিউ শেয়ার করা হোক। সরকার যেই করতে গেলো অমনি ক্ষেপে গেলাম। বলা হলো এটা নির্বাচনী বরাদ্দ? আমরা বলছি, ২ লাখ টাকা কিছু না। আরো বেশি দিতে হবে। অনেকে বলে ওরা টাকা

একনজরে গ্রামীণ ব্যাংক

* ১৯৮৩ সালে ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়
* বর্তমানে বিশ্বের ৭০টি দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম চলছে
* সদস্য সংখ্যা ৪৮ লাখ
* মোট সদস্যের ৯৬ শতাংশ মহিলা
* শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ ২৩,৫০৪.৯২ কোটি টাকা
* শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ঋণ পরিশোধ ২১,১৫৭.২৮ কোটি টাকা
* বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সম্পত্তি প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা

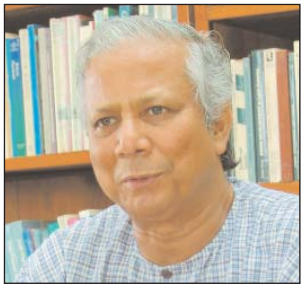

পিকেএসএফ আমাদের স্বপ্ন। এক পাতার পরিকল্পনা হলেও আমরাই তৈরি করবো। আমাদের ভাষা তোমাদের পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। আমাদের স্বপ্ন আমাদের ভাষায় হবে। আমাদের স্বপ্ন তোমাদের লোক এসে দেখিয়ে দিয়ে যাবে, এটা আমাদের দরকার নেই।

খেয়ে ফেলবে। আমি তো দেখছি সবাই খাচ্ছে, ওপরে খাচ্ছে, মাঝখানেও খাচ্ছে। নিচেরাও যদি খায় খাক। তবে আমার বিশ্বাস, যত নিচের দিকে যাবে তত খাওয়ার পরিমাণ কমবে, বাড়বে না। কারণ এটা তো এলাকার লোক দেখছে। আপনি শুধু বলে দিলেন এতো টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

২০০০ : এবার গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কথা বলতে চাই। গ্রামীণ ব্যাংকের ইমেজ আর গ্রামীণফোনের ইমেজ, পরস্পরের বিপরীতমুখী অবস্থান। আপনার কী মনে হয়?

ড. ইউনূস : দুটো ভিন্ন জিনিস। প্রথম কথা হলো, গ্রামীণ ব্যাংকের সঙ্গে গ্রামীণফোনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ব্যক্তিগতভাবে একটি লিঙ্ক আছে তবে ব্যবসা বা অন্য কিছুতে কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি, তা হলো গ্রামীণ টেলিকম। গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণফোনের ৩৮ শতাংশ শেয়ারের মালিক।

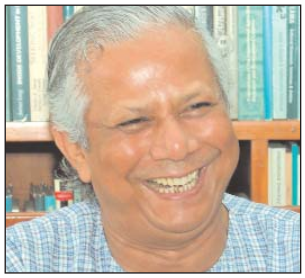

২০০০ : আপনারা যখনই মোবাইল নিয়ে কথা বলতেন, সম্ভবত '৯৪ সালে গ্রামের মহিলার হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেবেন- তখন কথাগুলো স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। এটা একটা বড় অর্জন। পাশাপাশি আরেকটা কথাও এসে যায়, আপনারা কলচার্জ অনেক বেশি নিচ্ছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের মোবাইল কোম্পানিরা মোবাইল কলচার্জ বেশি রাখছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অনেক বেশি বলে কি মনে হয় না।

ড. ইউনূস : এটা আসলে হিসাবের ব্যাপার। নরওয়ের কোম্পানি এটা চালায়। তারা ভাবছে রেট কমালে আয় কমে যাবে। রেভিনিউ কমে যাবে। ব্যবসায়ী হিসেবে রেভিনিউ কেন কমাবো? বরং বাড়াবো। কাজেই আমি যতক্ষণ এই রেট চালাতে পারবো ততক্ষণ চালিয়ে যাবো।

যদি দেখতাম রেট কমিয়ে দিলে ব্যবসা ভালো হবে, রেভিনিউ বাড়বে, তাহলে তাই করতাম। কিন্তু আমরা সেটা দেখাতে পারছি না।

২০০০ : আপনি তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে বিপ্লবের কথা বলেন। কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার হার নিয়ে এটা কীভাবে সম্ভব?

ড. ইউনূস : আইটির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই। মোবাইল ব্যবহার করতে শিক্ষার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মুখ। বরং আইটি ব্যবহার করলে লেখাপড়া থেকে মুক্তি দেয়া হবে। লেখাপড়া থেকে মুক্তি দেয়া কতো বড় আনন্দের ব্যাপার! এবং আইটি মানুষকে লেখাপড়া থেকে মুক্ত করে দেবে। একজন লেখাপড়া না জানা মহিলা মুখে কথা বলতে পারলেই আইটি ব্যবহার করতে পারবে। এখন যেকোনো দরিদ্র অসহায় মহিলা ইচ্ছা করলেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফোন করতে পারবে। আগে যেটা ছিলো অসাধ্য। দেখা যেতো কেউ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে দারোয়ান গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতো। এখন তা সম্ভব না।

আমরা গ্রামীণ মহিলাদের যখন পল্লীফোন দিই তখন একটা কার্ড দিয়ে দিই। সেই কার্ডে প্রধানমন্ত্রীর ফোন নাম্বারসহ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় এমপি, পুলিশ স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ ফোন নাম্বার দিয়ে দিই। আমি মাঝে মাঝে মহিলাদের প্রশ্ন করি আপনারা কি কখনো প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করেছেন? তা বলে না। বলি, আপনারা চোখে দেখেছেন তাঁকে। তারা বলে হ্যাঁ ছবিতে দেখেছি। আমি বলি কথা বলবেন? তারা বলে না, আমি... নানা রকম দ্বিধা করে। প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলে তার বাসায় ফোন বাজবে। তখন কেউ না কেউ ধরবে। হয় তার ছেলে ধরবে, নয়তো তার আত্মীয়স্বজন অথবা পার্সোনাল অফিসার কেউ না কেউ ধরে। তখন বলবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। বলবেন। মন খুলে কথা বলবেন। প্রধানমন্ত্রী যদি নাও ধরে তার সেক্রেটারিকে বলবেন। দেখেন আমাদের এলাকায় কি কান্ড হচ্ছে যে অত্যাচার চলছে এটা না থামলে কিসের প্রধানমন্ত্রী হলেন। এখন ওই মহিলা বলুক আর না বলুক, তার কাছে প্রধানমন্ত্রীর নাম্বার আছে এটাই বড় শক্তি। তাই বলছি প্রযুক্তির সঙ্গে লেখাপড়া লাগে এটা ঠিক না। কে বলছে কম্পিউটারে বসে লেখাপড়া লাগে? সেই টেকনোলজি উঠে গেছে। আমি কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলবো, কম্পিউটার আমাকে ব্যাক করবে। অর্থাৎ এখানে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে কমিউনিকেশনের সঙ্গে। এই যে দেখেন মোবাইল ফোন এলো। ১০ বছরও তো হয়নি। এতো দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে। গ্রামের সবচেয়ে ভেতরে চলে গেছে।

২০০০ : বলা যায় টেলিফোন বিপ্লব হয়েছে।

ড. ইউনূস : হ্যাঁ টেলিটেকনোলজির অগ্রগতি বিস্ময়কর। এই টেকনোলজি চালু করতে কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়েছে? কোনো কিছুই শেখাতে হয়নি। আমি আপনি গ্রামীণফোনের যেসব ফাংশন জানি, দেখা যাবে গ্রামের একজন মহিলা তার চাইতে বেশি জানে। অল্প টাকা দিয়ে সে বহু রকমের কাজ করতে চায়। একটা ফোন থেকে ১০ জায়গায় কিভাবে কানেকশন দেয়া যায়....।

২০০০ : তারা এন্টিনার প্রযুক্তি ব্যবহার করছে।

ড. ইউনূস : বুদ্ধির সঙ্গে টেকনোলজির সম্পর্ক। বুদ্ধি হলো মানুষের জন্মগত একটা ব্যাপারে। আপনি লেখাপড়া করেছেন বলে নানাভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারছি। লেখাপড়া না জানা একজন হয়তো সেভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু বুদ্ধি ঠিকই আছে। কাজেই তথ্যপ্রযুক্তি তার জন্য আরো বেশি দরকার। সে আরো বেশি উপকৃত হবে। আমি যেটা বারবার বলছি, যে সুযোগগুলো সহজে এসে যেতে পারতো আমরা পথকে বাধাগ্রস্ত করছি। যেমন সাবমেরিন ক্যাবলের কথা বলছি। এটা নিয়ে বহু চেঁচামেচি করছি। এখন সাবমেরিন ক্যাবল কক্সবাজারে এসে বসে আছে...।

আমাদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে আমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী। আর একটি কারণ তা হলো নতুন প্রযুক্তি, নতুন যুগের প্রযুক্তি আসছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। এখন বিপুল পরিমাণ প্রযুক্তি আসবে, যা একেবারে কাদামাটির মতো।

২০০০ : সাবমেরিন ক্যাবল যে সময়টা নেয়ার কথা ছিলো সে সময়টা আমরা নিচ্ছিলাম না, তখন আমরা কথা বলিনি কেন?

ড. ইউনূস : তখন আমরা জানতাম না। আমাদের কাছে আসেনি জিনিসটা। আমরা পরে জানতে পারি।

২০০০ : তখন আমলারা কি জানতো?

ড. ইউনূস : আমলারা জানতো। তাদের ওখানে ফাইল চালাচালি হয়েছে। তারা তখন বলতো, এ ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। দেশের তথ্য পাচার হয়ে যাবে। বেকুবরা বোঝেই না ক্যাবলের সুবিধা। একটা ফ্রি জিনিস লাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে। তারা তখন বলেছে এটা পরে করবো। এরপরও সুযোগ এসেছে। তখনও নিইনি। এখন এলো... এসে বসে আছে।

কক্সবাজারে এসে বসে আছে। শুধু চট্টগ্রামের সঙ্গে লিঙ্কআপ করা। একটা তার এনে সংযোগ ঘটালেই হলো।

২০০০ : এটার জন্য কয়েক মাস ধরে...

ড. ইউনূস : ৪ বার টেন্ডার হয়েছে। এখনো হচ্ছে না। আমরা চুপ চুপ বসে আছি। কেউ একটা টুঁ শব্দ করছে না। এই কানেকশন হলে সব কিছুর রেট কমে যাবে। গ্রামীণফোন রেট বেশি নেয় বলে চিৎকার করতে হবে না। রেট কমাতে বাধ্য হবে। ভিওআইপি ওপেন করে দিলে সারা পৃথিবীতে ফোন করলে কল রেট হবে ২ টাকা। তাহলে সরকার এটা ওপেন করছে না কেন? কার স্বার্থে?

২০০০ : ভিওআইপি অবৈধভাবে ব্যবহার করে কেউ কেউ কোটিপতি হয়েছে।

ড. ইউনূস : হ্যাঁ, কোটিপতি হয়েছে। অতএব ভিওআইপি যেহেতু আছে সেটাকে লিগাল করে দিলে, কলরেট দুই টাকার বেশি কোনো ক্রমেই হবে না। গ্রামীণফোন বাপ বাপ করে রেট কমাবে। বাজারে টিকে থাকতে হলে কলরেট কমাতে সবাই বাধ্য হবে।

২০০০ : এখানে তো না করে না। বলে দেবো...

ড. ইউনূস : দেবো বলে, দেয় না। সারা দেশে নেটওয়ার্ক আছে। ফাইবার ক্যাবল সংযোগ আছে। শুধু চিটাগাং-এ সংযোগ দিলেই হয়। এতে যে কমিউনিকেশনের উন্নতি হবে তা না, আইটি বিষয়ে যত সেক্টর আছে, যত সফটওয়্যার শিল্প আছে তাতেও বড় পরিবর্তন হবে।

২০০০ : সম্প্রতি আপনারা স্বাস্থ্য খাতে কাজ শুরু করেছেন। জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে হাসপাতাল তৈরি করতে যাচ্ছেন। আমাদের প্রশ্ন হলো, আপনারা যে স্বাস্থ্য সেবা দিতে চাচ্ছেন তা কি গরিব মানুষের জন্য, না কি প্রচলিত বাণিজ্যিক ধারায় করবেন।

ড. ইউনূস : আমরা নিজেরা কতোগুলো স্বাস্থ্য কর্মসূচি করেছি। খুব সীমিত জায়গায় নানা সীমাবদ্ধতায় চালিয়ে যাচ্ছি। সেখানে একজন এমবিবিএস ডাক্তার থাকে। প্যারামেডিক থাকে। হেল্‌থ ওয়ার্কার থাকে। একটা হেল্‌থ ক্লিনিক থাকে। একটা ল্যাব থাকে। আমরা গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের বলি, আপনারা যদি বছরে একশ' টাকা দেন, তাহলে সারা বছর পরিবারে স্বাস্থ্য সেবা পাবেন। এটাকে আমরা বলি হেল্‌থ ইনসিওরেন্স। এই ব্যবস্থায় ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দিলে ২ টাকা দিতে হবে। প্রেসক্রিপশনে যে ওষুধের নাম থাকবে সেটাও ওখানে পাওয়া যাবে। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যের বাইরেও যে কেউ এর সুবিধা পাবে। সে ক্ষেত্রে তাকে ৩০০ টাকা দিতে হবে। যদি কোনো জটিল রোগী আসে তখন আমরা কোনো প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে রেফার করবো। ওই হাসপাতালে সে ডিসকাউন্ট রেটে চিকিৎসা সেবা পাবে। আমাদের চেষ্টা হলো ওই যে আয় হবে, (১০০ টাকা ৩০০ টাকা) তা দিয়ে যেনো খরচটা পোষায়। এ কাজটা কয়েক বছর হলো করছি। এ পদ্ধতিতে আমাদের প্রায় ৯০ শতাংশ খরচ পোষায়। এখন আমরা এটাকে আরো প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছি। এছাড়াও নিরাপদ মাতৃত্বের ব্যাপারে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। প্রসবকালে মাতৃ মৃত্যুর হার বিশ্বের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি। আমরা এর পরিবর্তনে কাজ করছি। আমাদের এখানে প্রসব করলে, তাদের ছোটখাটো উপহার দিই আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য। উপহার হলো যে, বাচ্চা হলে তার একটা ডিজিটাল ছবি আর গ্রামীণ কাপড়। আমরা এটা করছি যাতে গ্রামের মহিলারা বাচ্চা প্রসবের ব্যাপারটায় আরো সচেতন হয়।

এছাড়াও বার্থ সার্টিফিকেটের ব্যাপারেও সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে বার্থ ডে বলতে হেডমাস্টার যে তারিখ বসায় সেটাই সারা জীবন বহন করি।

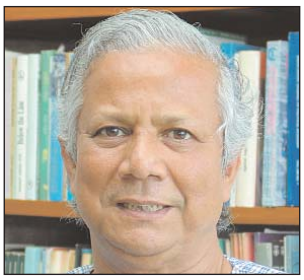

গরিবদের একটা লেবেলকে ঋণ দিয়ে থাকি। কথাটা ঠিক নয়। আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমরা ভিক্ষুকদেরও ঋণ দেই। শূন্য সুদে ৪৫ হাজার ভিক্ষুককে এখন ঋণ সুবিধা দিচ্ছি। ইচ্ছে করলে এই সংখ্যা আরো বহুগুণ বাড়াতে পারি

২০০০ : আমাদের প্রবাসে যেসব শ্রমিকরা গেছেন তাদের সবারই জন্ম তারিখ...

ড. ইউনূস : জানুয়ারির এক তারিখ। আমরা চোখের চিকিৎসাও করি। কৃত্রিম লেন্স বসানোর কাজ করি। আমার দুই চোখে লেন্স বসানো। আগে যারা আমাকে দেখেছেন চশমা পরা। এখন আমার চশমা লাগছে না। আমি লেন্স লাগিয়ে চলছি। এই টেকনোলজি আমরা গ্রামে নিয়ে গেছি। গ্রামে গত ১০ বছরে যাদের চোখে ছানি পড়ে অন্ধ ছিলো, তারা এই টেকনোলজি ব্যবহার করে পুরো সুস্থ হয়েছে। যারা চিন্তাও করতে পারেনি আবার তারা দেখতে পাচ্ছে। খরচ মাত্র আড়াই হাজার টাকা। আর গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য যদি না হন তবে ৪ হাজার টাকা। এই ব্যবস্থায় ঢাকা শহরে যদি কেউ করতে চায় তবে তার ৫০ হাজার টাকা খরচ হবে।

এ অবস্থা দেখে চিন্তা করলাম বিষয়টাকে আরো প্রসারিত করলে কেমন হবে? আমরা তো গ্রাম লেবেলে করেছি, এটাকে উপরের লেবেলে নিলে কেমন হয়?

এ চিন্তা থেকে জাপানি হসপিটাল টিমের সঙ্গে কথা হয়। তখন আমরা প্রস্তাব দিলাম তাদের সঙ্গে জয়েন্টলি হাসপাতাল করার। প্রথম অবস্থায় ঢাকায় ও চট্টগ্রামে হাসপাতাল করতে চাই। এ হাসপাতালে শুধু চোখের নয়, সব ধরনের চিকিৎসার করতে চাই। আশা করছি এ কাজেও সফল হবো। এটার জন্য ওই প্রচেষ্টা শুরু করছি।

গ্রামীণ কল্যাণ নামে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে, এর মাধ্যমে আমরা হেল্‌থ সার্ভিসটা দিতে চাচ্ছি।

২০০০ : প্রাথমিকভাবে ২টি হাসপাতাল হলেও পরবর্তীতে কি আরো বাড়বে?

ড. ইউনূস : অবশ্যই বাড়বে। কারণ আমরা এখানেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই চালাবো। আমরা ব্যবসা করবো।

২০০০ : আপনারা ব্যবসা...

ড. ইউনূস : কথাটা পুরো শেষ করি। আমরা ব্যবসা করবো ঠিকই, তবে গরিবদের এখানেও অগ্রাধিকার দেবো। দেখা গেলো একজন ধনী ব্যক্তি দেশের বাইরে গিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করে। আমরা বলবো দেশে বাইরের মতোই আমরা চিকিৎসা করবো তবে টাকা তোমার বেঁচে যাবে। অর্ধেক খরচ হবে। কিংবা যে ব্যক্তি অ্যাপলোতে যায় তাকে নিশ্চয়তা দেবো ওখানকার চাইতে কম খরচে ভালো চিকিৎসা দেবো। বড়লোকদের কাছ থেকে টাকা ঠিক মতোই নেবো। তবে গরিবদের প্রয়োজনে ফ্রি চিকিৎসা করাবো। যার যেমন আর্থিক সঙ্গতি সেভাবেই চিকিৎসা খরচ নেবো। আমাদের লক্ষ্য, বড়লোকদের কাছ থেকে বেশি নিয়ে গরিবদের অর্থ ঘাটতি পুষিয়ে দেয়া।

২০০০ : আপনি শুরু থেকেই কাজ করেছেন সরকারের বাইরে থেকে। কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে দেখলাম আপনি সরকারের পার্ট হয়ে কাজ করলেন। আমি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলছি। ওই সময়ে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

ড. ইউনূস : অভিজ্ঞতা ভালো।

২০০০ : নির্বাচিত সরকার অনেক বড় বডি নিয়েও কাজ করতে পারে না। নানা সমস্যায় পড়ে। অথচ তত্ত্বাবধায়কের সময় খুব ছোট্ট বডি নিয়ে বেশ স্মুথলি কাজ করে। সরকার কাজ করতে পারে না কেয়ারটেকার করতে পারে! এ ক্ষেত্রে আপনার ব্যাখ্যা কী?

ড. ইউনূস : এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার এক্সপেক্টেশনের জায়গাটা। কেয়ারটেকার সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশাটা কম থাকে। মানুষ ভাবে তারা ৩ মাসের জন্য যাবে। যেতে না যেতেই মেয়াদ শেষ হবে। তারা কী কাজ করবে? যার ফলে তারা যাই করে সেটাকে সবাই মেনে নেয়। অবশ্য কেয়ারটেকার সরকার কোনো বিতর্কিত বিষয়েও যেতে চায় না। তাদের কোনো অ্যাঙ্গেলও নেই। আমাদের নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। সবাই বাইরে থেকে আসে, চটপট নিজেদের কাজ করতে পারলেই হলো। কাজেই আমি বলবো, আমার ৩ মাসের অভিজ্ঞতাটা ভালো হয়েছে। সবাই চেষ্টা করেছি আইন মতো, সুন্দর মতো যেন কাজ করতে পারি। নানা রকম পলিটিক্যাল প্রেসার নির্বাচিত সরকারের থাকে, কেয়ারটেকার সরকারের থাকে না।

২০০০ : সে সময় প্রেসার কিন্তু আসে...

ড. ইউনূস : হ্যাঁ। প্রেসার আসে, তবে সেটাও নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রেসার। দৈনন্দিন কাজের বিষয়ে প্রেসার খুব একটা আসে না।

২০০০ : একটা দেশের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা এবং দুর্নীতি রোধের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো না হলে উন্নতি করাটা কষ্টকর। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

ড. ইউনূস : সবারই একই চিন্তা, রাজনৈতিক দলগুলোর সহমর্মিতা বাড়ানো, দুর্নীতি কমানো ইত্যাদি করতে হবে। দুর্নীতি থেকে কিভাবে মুক্ত হতে পারি এগুলো এখন সবার চিন্তা। আমাদের সবারই কাম্য, বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করুক। অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখুক। এই যে কয়েক দিন আগেই দেখা গেলো বিল ক্লিনটন, বুশ ও তার বাবা জর্জ বুশ একসঙ্গে সুনামির জন্য কাজ করলো। অথচ দেখেন, কিছুদিন আগেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্লিনটন বুশের ব্যাপারে কেমন সমালোচনা করলো, আবার বুশও ক্লিনটনের সমালোচনা করলো। কিন্তু প্রয়োজনে একসঙ্গে আবার কাজ করছে। এসব দেখে শিক্ষা নিতে হবে। ভিন্নমত থাকতেই পারে, তাই বলে হানাহানির পথে তো যেতে পারি না।

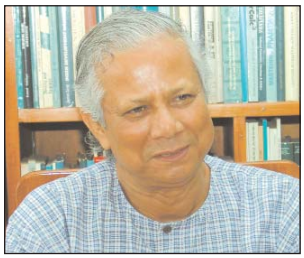

২০০০ : এ মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় তেল, গ্যাস। এগুলোকে আমরা চুক্তি করেই বিদেশী কোম্পানিকে দিয়েছি। বৈধভাবেই দিয়েছি। প্রশ্ন হলো, যেসব কোম্পানিকে দিয়েছি তারা কতোটা যোগ্য! কারণ অক্সিডেন্টালের কারণে মাগুরছড়ায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। নাইকোর কারণে টেংরাটিলায়ও হয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে আমরা দেশের সম্পদ হারাচ্ছি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সম্পদ হারাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যাটা কী?

ড. ইউনূস : এখানেও প্রধান সমস্যা, আমরা জানিই না কিভাবে চুক্তি করতে হয়। জানলেও দেশের স্বার্থের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখেছি।

২০০০ : দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাড়ি নিয়ে নিয়েছি।

ড. ইউনূস : যাই হোক, আমি ওটা না বলে বলছি, ওখানেই আমাদের ব্যর্থতা। সরকার যাকে নিয়োগ দিয়েছে সে দেশের স্বার্থ দেখছে না। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

এসব কারণেই আমাদের প্রধান ইস্যু হয়েছে দুর্নীতি ও সংঘাতময় রাজনীতি। আর এনার্জি হলো বড় জিনিস। সারা পৃথিবীতেই এর চাহিদা আছে। কাজেই আমার, তোমার উচিত এই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ করা। আর একটা বিষয় হলো কয়লা। কয়লা এখন গ্যাসের চাইতেও চাহিদাসম্পন্ন সম্পদ। এই কয়লার আকর্ষণে এখন টাটা কোম্পানি আসছে, আরো অনেকে আসবে। আমাদের সবদিকই দেখতে হবে। সম্পদ ধরে রাখবো নাকি ব্যবহার করবো। কয়লা ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হতে পারে সেদিকও দেখতে হবে। আর এক কোম্পানিকেও সব সম্পদ দেয়া যাবে না। দেখে শুনে বুঝে সম্পদের ব্যবহার করতে হবে।

২০০০ : সব সময় দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।

ড. ইউনূস : অবশ্যই। এদিকে ভারত চিন্তা করছে বার্মা থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস নেবে। পাইপ লাইন আমাদের ওপর দিয়ে যাবে। আমি বলছি ওই পাইপলাইন দিয়ে আমরাও গ্যাস নিই না কেন। আমাদের গ্যাস আছে থাক। ওই গ্যাস দিয়ে চট্টগ্রামে সারকারখানা তৈরিসহ নানা কাজে লাগানো যেতে পারে। একটা বিষয়, বার্মা তো বিক্রেতা, ভারত কিনছে, আমাদের দেশের ওপর দিয়ে নিচ্ছে, আমরাও কিনতে পারি উত্তমভাবে ব্যবহার করতে পারি।

আসলে সব কিছু সুন্দর মতো করার জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। দুর্নীতি, বিদ্যুৎ এবং চট্টগ্রাম বন্দর! চট্টগ্রাম বন্দরকে যদি আন্তর্জাতিক মানের করতে না পারি তবে দেশের উন্নতি হবে না।

২০০০ : আসলে আমাদের দেশের উন্নতির অন্তরায় একটা...

ড. ইউনূস : হ্যাঁ, এক হিসেবে একটা। গোড়া....। তারপরও বলবো চট্টগ্রামকে যদি বিশাল বন্দর বানাতে না পারি অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করা বড় কঠিন হবে। চিন্তা করতে হবে চট্টগ্রাম ৫ দেশের বন্দর, এটা মিয়ানমারের বন্দর, এটা নেপালের বন্দর, এটা পূর্ব ভারতের বন্দর, এটা ভুটানের বন্দর, এটা বাংলাদেশের বন্দর। এভাবে চিন্তা করে বৃহদাকারে প্রসার ঘটাতে হবে।

২০০০ : অনেকে বলেন এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে?

ড. ইউনূস : এটা ভ্রান্ত ধারণা। সিঙ্গাপুর কি বড় জংশন নয়। ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকলে কি হবে? দেশের উন্নতিতে আরো প্রসারিত হতে হবে। মন বড় করতে হবে।

২০০০ : এটা করবে কে?

ড. ইউনূস : এটা আমাদেরই করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ এসে করে দেবে না।

২০০০ : নির্বাচন সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন করে আমাদের প্রশ্নপর্ব শেষ করবো। নির্বাচন সংস্কার নিয়ে কথা হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনি কিছু বলুন।

ড. ইউনূস : না, আমি এ বিষয়ে কিছু বলবো না। দেখা গেলো আমার সাক্ষাৎকারে এই অংশের একটা শব্দ নিয়ে কেউ হয়তো বললো, এটা বলার উনি কে? আমি এ বিষয়ে এখন কিছুই বলতে চাচ্ছি না।

২০০০ : নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন, এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি...

ড. ইউনূস : অনুভূতি কিছু হয়নি। পেপারে দেখলাম যা সেটুকুই জানি। এর বেশি কিছু জানি না।

২০০০ : আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এমন কিছু আসেনি অথচ আপনি বলতে চান, এমন বিষয়ে আপনি আমাদের পাঠকদের জন্য কিছু বলুন।

ড. ইউনূস : আমি স্বভাবতই আশাবাদী। আমি মনে করি আগামী ২০ বছরের মধ্যে আমরা পৃথিবীর দৃষ্টান্তমূলক একটা অবস্থানে যাবো। আমাদের আশার কারণ আমাদের তরুণ সমাজ। তারা অজানাকে জয় করতে আনন্দ পায়।

ঘরকুনো বাঙালি হবার অপবাদ তারা সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়েছে। পৃথিবীর হেন বড় শহর নেই যেখানে তরুণ বাংলাদেশীকে কঠোর পরিশ্রমরত অবস্থায় দেখা যাবে না। কাজ যত কঠিন, তাদের আনন্দ যেন তত বেশি।

আমাদের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে আমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী। আর একটি কারণ তা হলো নতুন প্রযুক্তি, নতুন যুগের প্রযুক্তি আসছে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। এখন বিপুল পরিমাণ প্রযুক্তি আসবে, যা একেবারে কাদামাটির মতো। সুন্দর মতো, কায়দা মতো গড়তে জানলে বিশাল বিনিয়োগ আনারও কোনো সমস্যা হবে না।

শেষ কথা হলো, যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক না কেন, আমরা দ্রুতবেগে এগিয়ে যাবো। অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের নেতৃত্ব দেবে।

ছবি : **তুহিন হোসেন**

তোমরা যদি গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শ সত্যিকারভাবে বিশ্বাস কর, তবে একটা অঙ্গীকার করবে, জীবনে কারো কাছে কোনো দিন চাকরি চাইবে না। এটা তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার হবে। উপরন্তু মনে করবে, তুমি মানুষকে চাকরি দেবে। কিন্তু বলতে পারবে না, স্যার চাকরি কোথা থেকে দেবো